দৈনিক জনকণ্ঠ

২১/৯/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২......

এইচএসসির ফল-বিপর্যয়

একসময় ছিল যখন স্কুলের শেষ ধাপের
পরীক্ষা ও কলেজের প্রথম পর্বের পরীক্ষার
ফল প্রকাশিত হলে সারাদেশই আন্দোলিত
হতো। কিন্তু অতীতের মতো ফলাফলের সঙ্গে
সংশ্লিষ্টতা নেই এমন মানুষেরা আজ আর
ততটা উদ্বেলিত হয়না।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরীক্ষার্থী ও সকল
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভীর প্রত্যাশা নিয়ে এ
ফলপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করে। কিন্তু এবার সত্যিকার অর্থেই এইচএসসি
পরীক্ষার ফল সারা দেশের মানুষকে হতাশ করেছে। এবার পরীক্ষার গড় পাসের
হার শতকরা ২৬ দশমিক ১১ ভাগ। অর্থাৎ ৭৩ দশমিক ৮৯ ভাগ ছাত্রছাত্রী
অকৃতকার্য হয়েছে। গত বছর এই পাসের হার ছিল ৩৭ দশমিক ০৩ ভাগ
সেটাও কোন আত্মশ্লাঘার জন্ম দেয় না!

এটাকে দেশের পক্ষে একটি বড় রকম দুর্ভাগ্য বলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই
যেছাত্রসমাজ দেশের ভাবীকালের নাগরিক, তাদের এই নাজুক অবস্থা
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, গত
বছর থেকে বিশ্বস্বীকৃত আধুনিক পদ্ধতি- গ্রেডিং সিস্টেমে প্রথমবারের মতো
এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গতবার এই নিয়ে নানাধরনের অস্পষ্টতা
অস্বচ্ছতা ও বোর্ডের কতিপয় কার্যকলাপকেও ফল বিপর্যয়ের জন্য কিছুটা দায়ী
করা হয়। গত বছর জনকণ্ঠ এ ব্যাপারে খুব সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য করে। এমনও বল
হয়, ফল প্রকাশের পর পরই দেশ জুড়ে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়
রিপোর্টে বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই সমস্ত বিষয়টি ভবিষ্যতে স্বচ্ছ কা
তুলে ধরতে বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, এসব লেখালেখির ফলে, দেরিতে হলে
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফলাফলের একা
ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আজ তাই আর সেসব কথার দোহাই দিয়ে কোন লা
নেই। তাহলে আজ কেন এই ফলবিপর্যয়? বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষাবিদ ও অ
পণ্ডিতবর্গের মতামত পাঠে জানা যায়, আমাদের পঠন-পাঠন পদ্ধতিই ছি
অবৈজ্ঞানিক, যার ফলে শুধু মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে পরীক্ষা বৈতরণী পাড়ি দেয়া যেত
কিন্তু যখন গোটা বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা চালু হলো, তখন থেকেই অনেকে
মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একটি চালু কথা আছে
যথার্থভাবে নকল করতে গেলেও কিছুটা পড়াশোনা লাগে। তাই যখন জনকণ্ঠে
বিভিন্ন পত্রিকায় বলা হয়, শতকরা ৭৪ ভাগ পরীক্ষার্থীকে ফেলঘোষণার মাধ্যমে
প্রকাশিত এইচএসসির ফল নকলবাজ ছাত্রছাত্রীকে পড়ার টেবিলে ফেরার ওয়া
দিয়ে গেল, তখন সেই মন্তব্যটি বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পায়।

কেন্দ্র ও নকল একসঙ্গে থাকবেনা বলে শিক্ষাবোর্ডগুলো যে স্লোগান, প্রচারাভিয
ও নকলবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তারই পরিণতি স্মরণকালে
ফলবিপর্যয়। বাঁধাধরা কয়েকটি অধ্যায় পড়ে, বাছাই করা কিছু প্রশ্ন মুখস্থ ক
অথবা টিউটর বা কোচিং সেন্টারের ওপর ভর করে পরীক্ষায় সুফল পাও
এমনকি পাস করাও এখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্য
হামিদা আলীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, দেশ জু
এই ফলবিপর্যয় ছাত্রছাত্রীদের পড়ার টেবিলে ফিরে যাবার ওয়ার্নিং দিল। অবা
নকলের সুযোগ যেমন বন্ধ হয়ে আসছে, তেমনি নকলের সুযোগ পেয়েও এ
আর তেমন লাভ নেই। তাঁর সকল কথার সারকথা হচ্ছে, সারা বই খুঁটিয়ে খুঁটি
নাপড়লে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না। তাই বলে প্রাইভেট টিউ
অথবা কোচিং সেন্টারগুলো যে অচিরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে, তেমন ভাবার বে
কারণ নেই। তাই তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে। তাদের এমনভ
পড়ান, যাতে গোটা বই তাদের নখদর্পণে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষকদেরও আ
আবেদন জানাব, আপনারা নিজেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্রছাত্রীকে কোচিং দা
পরিবর্তে তাদের সত্যিকারের জ্ঞানদানে তৎপর হোন।

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জান
শিক্ষার যথার্থ আলোবঞ্চিত এসব অগণিত ছাত্রছাত্রীকে সারা মন-প্রাণ ঢেলে দি
আদর্শ শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তুলুন। এরাই ভবিষ্যতে আপনাদের ও দেশের
উজ্জ্বল করবে। আসলে বিদ্যাই একমাত্র জিনিস যা খরচ করলে লাভ ছ